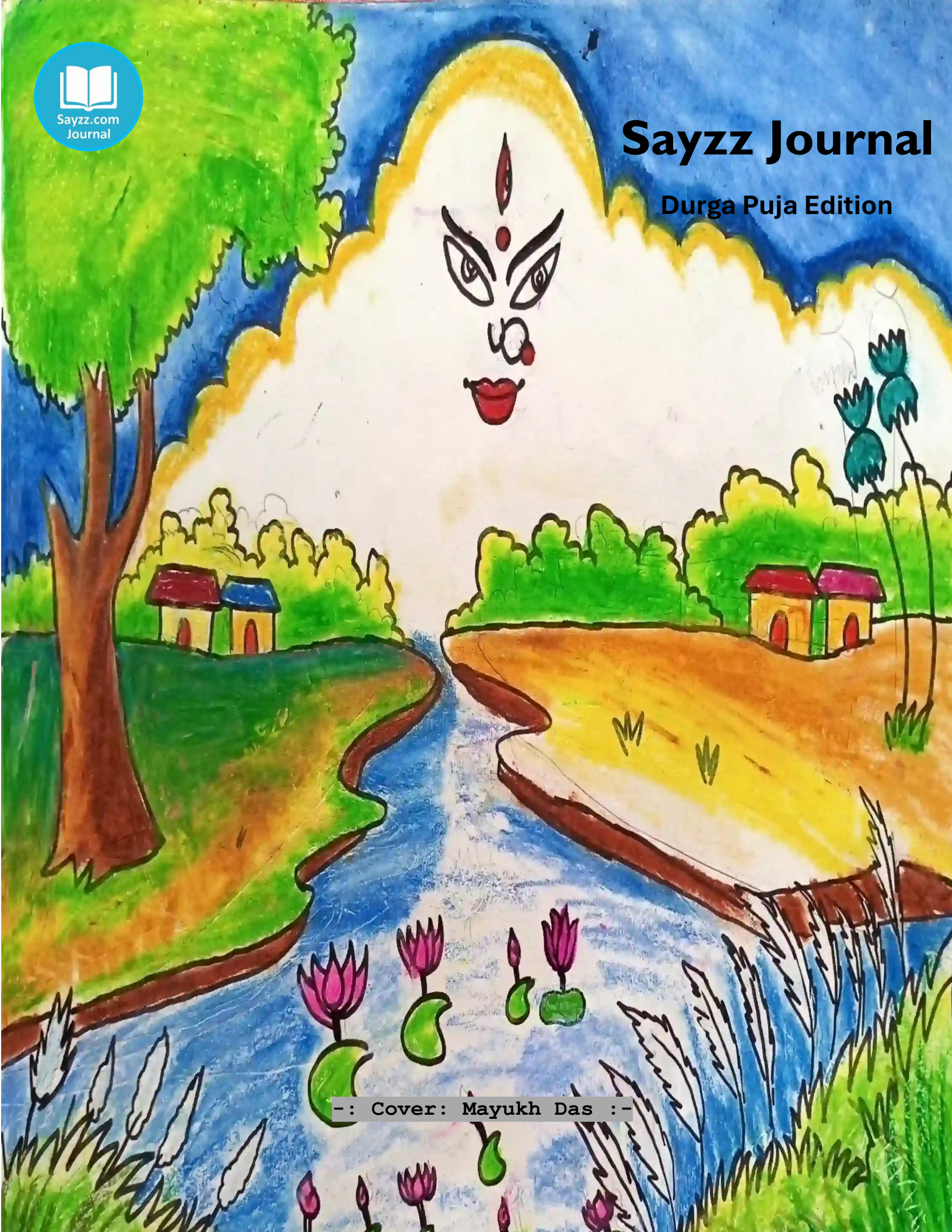

Sayzz.com
Journal
Sayzz Journal
Durga Puja Edition
-: Cover: Mayukh Das :-

ভূমিকা

আবার এসেছে উৎসবের দিন, হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছে শারদীয়ার আনন্দ। পুজোর গন্ধে, ঢাকের তালে, নতুন পোশাকের রঙে, আর মেলামেশার উচ্ছ্বাসে সেজে উঠেছে চারদিক। Sayzz Journal – Durga Puja Edition এই আনন্দঘন সময়কে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এক ছোট্ট প্রয়াস।

এই সংখ্যায় রয়েছে গল্প, কবিতা, স্মৃতি আর ছবির মেলবন্ধন। যেখানে ধরা থাকবে পুজোর আবেগ, আচার, আর আমাদের সংস্কৃতির রঙিন ছোঁয়া। পাঠকের হৃদয়ে এই পুজো সংখ্যার পাতাগুলো যেন নিয়ে আসে উৎসবের উষ্ণতা ও নতুন আনন্দের বার্তা।

শারদীয়া শুভেচ্ছা রইল সবার জন্য!

প্রকাশনা

Sayzz.com ও JYCSM, Chandan Nagar

-: সূচিপত্র :-

দুর্গাপূজোর ইতিহাস ও প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা - রাজু দাস

বীরভূমে শরতের ঘোরাঘুরি - তমাল দে

এক পশলা বৃষ্টি - ইস্পিতা সরকার

বন্ধু (কবিতা) - সুজাতা দাস

চারুবালা (সাসপেন্স ছোটগল্প) - রাজু দাস

মায়ের আগমন (কবিতা) - পূজা ঘোষাল

দুর্গা পূজার আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা - সেপ্টেম্বর ২০২৫

একুরিয়ামে রঙিন মৎস্য পালন ও শিশু মনের বিকাশে সৃজনশীলতা - গৌতম দাস

মহাশূন্য (কবিতা) - তিয়াসা দত্ত

অঙ্কন বিভাগ

দুর্গাপূজোর ইতিহাস ও প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা

রাজু দাস

বাংলার প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা নিয়ে ইতিহাসে অনেক কৌতূহল আছে তাই না। ঠিক আছে, আপনাকে বাংলার প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজার গল্পটা একটু ইতিহাসের ছোঁয়ায় বলি।

সময়টা আঠারো শতকের শেষভাগ। বাংলায় তখন জমিদারবাড়ির দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয়। রাজবাড়ি কিংবা ধনী পরিবারগুলির পূজা ছিল একেবারে রাজকীয় আয়োজন, অসংখ্য লোক, সঙ্গীত-নৃত্য আর ভোজ। কিন্তু সাধারণ মানুষ? তাঁরা শুধু দর্শক হয়ে থাকতেন, পূজার আনন্দ ভাগ করে নিতে পারতেন না।

এই সময়েই হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে সেন বাড়ি হুগলি জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা বিখ্যাত দুর্গাপূজার জন্য পরিচিত ছিল। গুপ্তিপাড়া গ্রামে একদল তরুণের মাথায় আসে অভিনব চিন্তা।

তাঁরা ভাবলেন –
“দেবী দুর্গা তো সকলের মা, তবে কেন তাঁর পূজা কেবল জমিদারদের অধিকার হবে? আমরা নিজেরাই কি পারি না সবার তহবিল মিলিয়ে, সবার শ্রমে, সবার আনন্দে একসঙ্গে পূজা করতে?”

এই ভাবনা থেকেই ১৭৯০ (কিছু মতে ১৭৯২) সালে শুরু হয় বাংলার প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা।

“বারোয়ারি” শব্দের উৎপত্তি ‘বারো’ আর ‘ইয়ারি’ থেকে, অর্থাৎ বারো জন বন্ধু বা সহযোগীর উদ্যোগে যে পূজা হয়। যদিও বাস্তবে শুধু বারো জন নয়, পুরো পাড়ার মানুষই এগিয়ে এসেছিল।

সেই পূজার বিশেষত্ব ছিল –
এখানে কোনো জমিদার ছিল না, ছিল পাড়ার ছেলেদের যৌথ উদ্যোগ।
টাকাপয়সা উঠেছিল চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে।
পাড়ার সবাই - ধনী গরিব নির্বিশেষে অংশ নিয়েছিল সাজসজ্জা, আয়োজন আর পূজায়।
পূজার পর সবাই মিলে ভোগ খেয়েছিল, যা ছিল একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

বারোয়ারি থেকে সার্বজনীন
এই গুপ্তিপাড়ার পূজা-উদ্যোগ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে কলকাতা সহ বাংলার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল এই ধারা। আর এভাবেই “বারোয়ারি দুর্গাপূজা” ক্রমে পরিচিত হল “সার্বজনীন দুর্গাপূজা” নামে; যা আজ বাংলার সংস্কৃতি ও উৎসবের মেরুদণ্ড।

অর্থাৎ, বাংলার দুর্গাপূজার ইতিহাসে গুপ্তিপাড়ার এই উদ্যোগ শুধু একটি পূজা নয়, সাধারণ মানুষের হাতে পূজা ফিরিয়ে আনার এক বিপ্লব।

গুপ্তিপাড়া যেতে সবচেয়ে সহজ উপায় :

ট্রেন - হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল - কাটোয়া লাইনের লোকাল, সরাসরি Guptipara স্টেশন (প্রায় ২ ঘন্টা)।

রোড - কলকাতা থেকে NH2 ধরে ব্যান্ডেল হয়ে বালাগড়ের দিকে লোকাল রোডে (প্রায় ৩–৪ ঘন্টা)।

বীরভূমে শরতের ঘোরাঘুরি

তমাল দে

শরতের আকাশে তুলোর মতো সাদা মেঘ, কাশফুলে ভরা মাঠ, হাওয়ায় শিউলির গন্ধ। এমন সময় বাঙালির মনে একটাই ডাক জাগে, দুর্গাপূজা। এ বছর শহরের কোলাহল পেছনে ফেলে আমি ছুটে গেলাম বিরভুমে। এখানকার পূজা একেবারে আলাদা। গ্রামীণ সরলতা, তালগাছের ছায়া, পুকুরপাড়ের ধুনুচি ঢাক আর হাসিখুশি মানুষজন মিলেই গড়ে তোলে এক অনন্য আবহ। গত বছর দুর্গাপূজা হয়েছিল ৮ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত।

ষষ্ঠী: সিউড়ির রাজবাড়ি থেকে শুরু -

হাওড়া থেকে ট্রেনে পৌঁছলাম সিউড়ি। ষষ্ঠীর বিকেলেই শহর জেগে উঠেছে। সিউড়ি বড়া ঠাকুরবাড়ির শতবর্ষ প্রাচীন পূজা এখনো গৌরবের প্রতীক। চৌচালা ঘরের প্রতিমা, মাটির আলপনা, তালপাতার পাখায় সাজসজ্জা। সবকিছুতেই মিশে আছে পুরোনো দিনের গন্ধ। সন্ধ্যা নামতেই ঢাকের বোল, কাশর ঘন্টা আর প্রদীপের আলোয় জমে উঠল রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ। মনে হচ্ছিল ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছি।

সপ্তমী: গ্রামবাংলার প্যান্ডেল দর্শন -

সাইকেল ভাড়া করে বেরোলাম আশেপাশের গ্রাম ঘুরতে। সাহাপুর গ্রামে পুকুরপাড়ে বাঁশের মণ্ডপে প্রতিমা বসানো হয়েছে। কোনো থিম নয়, নিখাদ ভক্তি। মণ্ডপের চারপাশে কাশফুল দুলছে, ছোটরা রঙিন জামা পরে নাচছে ঢোল ঢাকের তালে। গ্রাম্য মেলায় দোকানে পাওয়া গেল মুড়ি মুড়কি, পাটালি গুড় আর খুদখাদ্য। বিজয়ার প্রস্তুতি হিসেবে নৌকা সাজানো হচ্ছে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য। শহরে এমন দৃশ্য দেখা যায় না।

অষ্টমী: শান্তিনিকেতনের ছন্দে -

অষ্টমীর দিন পৌঁছালাম বোলপুর শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যানভূমি পূজার কদিনে যেন নতুন প্রাণ পায়। উত্তরায়ণের আঙিনা ঘুরে পৌঁছালাম প্রান্তিকপল্লির সার্বজনীন পূজায়। এখানে নেই শহরের ঝলমলে থিম, আছে মাটির প্রদীপ, সাঁওতালি নাচ আর খোল করতালের সুর। সেই সঙ্গে খয়রাশরাই মোড়ে বসা অষ্টমীর মেলা। ঝালমুড়ি, ঘুগনি, জিলিপির গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছিল। ছোটদের হাতে বাঁশি আর রঙিন বেলুন। দৃশ্যটা আজও চোখে ভাসে।

নবমী: লাবপুরের মেলা -

নবমীর সকালেই চলে গেলাম লাবপুর। বিশাল মাঠে বসেছে এক মহা মেলা। সারি সারি দোকানে মাটির খেলনা, বাঁশি, কাঠের ঘোড়া আর খেজুরগুড়ের পাটালি। গ্রামের দুর্গাপূজা এখানে শুধুই পূজা নয়, বরং সামাজিক উৎসব। ঢাকের আওয়াজে ধুনুচি হাতে নেচে উঠল গ্রামবাসী। আমরাও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম, উৎসবের উল্লাসে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

দশমী: ময়ূরাক্ষীর ঘাটে বিদায়ের সুর -

দশমীর বিকেল সিউড়ির ময়ূরাক্ষী নদীর ঘাট যেন অন্যরকম সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছিল। প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নামল ঢাকের তাল আর আতশবাজির ঝলকে। নারীরা সিঁদুর খেলায় মাতলেন, হাসির মধ্যেও বিষাদের সুর। প্রতিমা যখন ধীরে ধীরে ভেসে গেল নদীর জলে, তখন অস্তগামী সূর্যের আলোয় সেই দৃশ্যটা মনে হল অপূর্ব এক ছবি। নদীর ঢেউ যেন বলে গেল, আসছে বছর আবার হবে।

ভ্রমণ টিপস:

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে সিউড়ি বা বোলপুর পর্যন্ত একাধিক ট্রেন চলে। বাস সার্ভিসও আছে। সেরা ট্যুর প্যাকেজ।

কোথায় থাকবেন: সিউড়ি শহরে বেশ কয়েকটি লজ, আর বোলপুর শান্তিনিকেতনে হোটেল রিসর্টের ব্যবস্থা আছে। আগেভাগে বুকিং করাই ভালো।

কি খাবেন: শান্তিনিকেতনের ঘুগনি, ঝালমুড়ি, জিলিপি, লাবপুরের মেলার পাটালি গুড় আর সিউড়ির চা সিঙ্গারা অবশ্যই খেতে হবে।

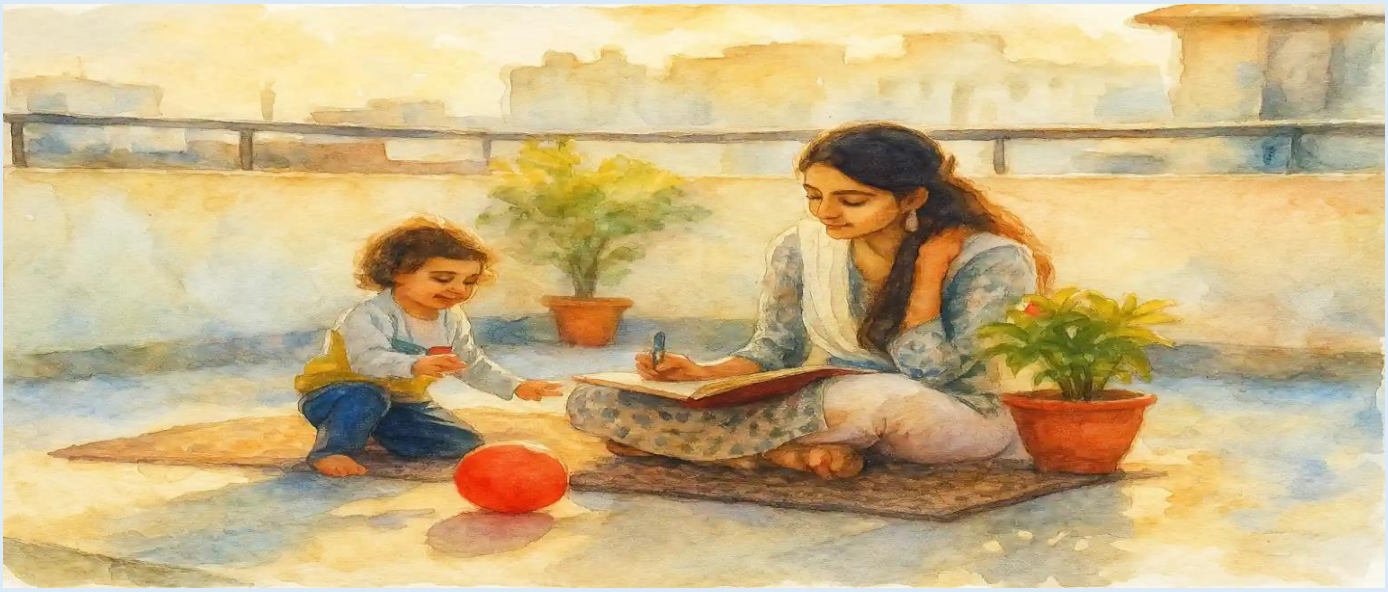
বিরভুমের পূজা মানে শুধু প্রতিমা দেখা নয়, বরং মানুষ, প্রকৃতি আর সংস্কৃতির মিলনমেলা। শহরের থিম প্যান্ডেল চোখ ধাঁধানো হলেও, বিরভুমের গ্রামের সরল আনন্দের স্বাদ হৃদয়ে দীর্ঘদিন থেকে যায়। পূজার সেই কদিন আমাকে শিখিয়েছে, উৎসবের আসল রূপ শুধু আলো ঝলকানি নয়, বরং মানুষের মিলন আর প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ।

এক পশলা বৃষ্টি

ইস্পিতা সরকার

বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে চারপাশ ভিজে গেছে। জানলার কাঁচে আঙুল ছুঁইয়ে চুপচাপ বসে আছে ঐশী। বহুদিন পর আজ ডায়েরিটা খুলেছে সে। পাতাগুলো যেন ধুলো জমে গেছে, তেমনি তার অনুভূতিগুলোরও দীর্ঘদিন স্তব্ধ হয়ে ছিল।

জীবনটা সহজ ছিল না। ভাঙা স্বপ্ন, দীর্ঘ রাতের নির্ঘুমতা, নিঃসঙ্গতা, বিশ্বাসভঙ্গ আর নিজের সঙ্গে নীরব যুদ্ধ - সব কিছু মিলিয়ে একটা বোঝা হয়ে উঠেছিল সে। নিজের কথা কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেনি কখনো, তাই ডায়েরিটাই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। মাঝপথে সেটাও ছেড়ে দিয়েছিল... লেখা, অনুভব, নিজেকে বোঝা - সব হারিয়ে গিয়েছিল।



কিন্তু আজকের এই এক পশলা বৃষ্টি যেন ভেতরের জমে থাকা ক্লান্তি ধুয়ে নিয়ে গেছে। আগের মতো সেই দমবন্ধ ভাব আর নেই। জীবনের ঝড় থেমে গেছে। মুখে এখন প্রশান্তির ছায়া।

ডায়েরির প্রথম পাতায় কলম ছুঁইতেই সে লিখে ফেলল --
“আজ অনেক দিন পর আবার লিখছি... হয়তো নিজের সঙ্গে একটু কথা বলার সময় হয়েছে।”

কিছু মানুষ জীবনে এসে এতটা আপন হয়ে যায় যে, বিশ্বাসই হয় না এই মানুষটা একদিন ছিল সম্পূর্ণ অচেনা। ঐশীর জীবনের তেমনই এক মানুষ - তন্বী। ছোট্ট, ফুটফুটে এক পরি।

তন্বী ঐশীর নিজের সন্তান নয়, রক্তের সম্পর্কও নেই। তবু এক অদ্ভুত টান, এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে তারা। তন্বীর “মা” ডাকা, তার ছোট ছোট প্রশ্ন, নিঃশর্ত ভালোবাসার মধ্যে ঐশী খুঁজে পেয়েছে জীবনের সমস্ত হারানো রঙগুলো।

* * * * *

স্কুলজীবনে ঐশী ছিল অসম্ভব মেধাবী। স্বপ্ন ছিল - একদিন আদর্শ শিক্ষিকা হবে সে, যে শুধু জ্ঞান দেবে না, ভালোবাসাও ছড়াবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ে স্বপ্ন দেখা সহজ নয়।

"মেয়ে হয়ে এত পড়াশোনার দরকার কী?"
"কিছু হলেই বিয়ে দিয়ে দাও, ঝামেলা মিটে যাবে।"
এই সব কথার ভেতর দিয়েই এগিয়েছিল ঐশী।

মাস্টার্স করার সময়েই বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সংসারের চাপ, মায়ের চোখের জল - সব মিলিয়ে একসময় তাকে বিয়েতে রাজি হতে হয়। তবে সে একটা শর্ত রেখেছিল - পড়াশোনা সে ছাড়বে না।

আর সেই স্বপ্নকে বোঝে এমন একজন মানুষই এসেছিল তার জীবনে - সম্বিত।
সম্বিত, ঐশীর স্বামী, প্রেমিক, সাথি। ভীষণ ভালো মানুষ। ঐশীর কোনো স্বপ্নকে সে বাধা দেয়নি, বরং আপন করে নিয়েছে। ঐশীর মতো একজন নারীকে ভালো না বেসে থাকা অসম্ভব - সম্বিতও ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে।

ঐশী মাস্টার্স শেষ করে একটি কলেজে যোগ দেয়। ওরা তখন স্বপ্ন গড়ছে দুজন মিলে। ছোট ছোট সুখে, একসাথে গল্পে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সময় কেটে যাচ্ছিল।

এই সময় থেকেই পরিবার থেকে চাপ আসে - "বাচ্চা কবে হবে?" ঐশী আর সম্বিত যতটা সম্ভব সামলে নিচ্ছিল সব। কিন্তু... সুখ কি সবাইকে সয়?
একদিন সন্ধেবেলা, ছাদে বসে কফি খেতে খেতে ঐশী হেসে বলছিল, "এই কদিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না... যা খাচ্ছি সবেতেই গা গুলিয়ে উঠছে।" হঠাৎ ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সম্বিত উদ্বিগ্ন হল, কিন্তু বাড়ির লোকজন খুশি হয়ে বলল, "মনে হচ্ছে কোনও সুখবর আসতে চলেছে!"

সম্বিত বলল, "তবে তো কালই ভালো একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।"

ঐশী মনে মনে আনন্দে ভরে উঠল। পাঁচ-ছয় বছরের দাম্পত্য জীবনে সুখ-দুঃখ মিলিয়ে অনেক কিছু পেরিয়ে এসেছে তারা। এবার হয়তো সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তটা অপেক্ষা করছে।

পরদিন ওরা গেল ডাক্তারের কাছে। কিছু টেস্ট করানো হল। রিপোর্ট হাতে আসতেই সম্বিতের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ঐশী গর্ভবতী নয়। বরং সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ইউটেরাইন ক্যান্সারের। ডাক্তারের ঠোঁটের জড়তা আর চোখের ভাষাই বলে দিচ্ছিল - এটা খুব সাধারণ কিছু নয়।

সম্বিত ঐশীকে কিছুই জানাল না। বলল, "আরও কিছু টেস্ট করতে বলেছে।"

বাড়ি ফিরে দু'জনে চুপচাপ। রাতে, কথা না বলেই তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। ফুপিয়ে কাঁদল। সব স্বপ্ন যেন এক লহমায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

* * * * *

চিকিৎসা শুরু হল। ধীরে ধীরে ঐশী এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল যে কলেজের চাকরি ছাড়তে হল। তারপর একদিন... ডাক্তার জানালেন, ঐশী আর কখনও মা হতে পারবে না। ঐশীর ভেতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। উচ্ছ্বাস ভরা মেয়েটি একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল। সম্বিত পাশে থেকেও কিছু করতে পারছিল না। ঐশীর ইচ্ছেশক্তি ভেঙে পড়েছিল। চিকিৎসাতেও সাড়া মিলছিল না। কাউন্সেলিং, অনুরোধ, আদর - সবই ব্যর্থ হচ্ছিল।

তখনই সম্বিত একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়। সে মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করে, এক অনাথ আশ্রম থেকে একটা শিশুকে নিয়ে আসে।
ঐশীর সামনে শিশুটিকে তুলে ধরে বলল —
"এই যে, তোমার বাচ্চা।"

ঐশীর চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল...
কিন্তু সেই অশ্রুর সঙ্গে মিশে ছিল এক নতুন আশার আলো। ঐশী শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যেন জীবনের হাহাকার আর শুন্যতার অবসান হল সেই মুহূর্তে।

আজ ঐশী সম্পূর্ণ সুস্থ।
তার কোলে ফুটফুটে একটা মেয়ে - তন্বী। হ্যাঁ, ঐশী তার মেয়ের নাম রেখেছে তন্বী। তন্বী আজ তার জীবনের সব রং, সব আলো।
ঐশী আবার কলেজে ফিরবে খুব শীঘ্রই। আর তন্বীকে নিজের মতো করে বড় করে তুলবে—ভালোবাসায়, সাহসে, শিক্ষায়।

সম্বিতের সেই এক সিদ্ধান্ত...
এক পশলা বৃষ্টির মতো তন্বীকে নিয়ে এসেছিল ঐশীর জীবনে। ঠিক যেমন গুমট গরমের পর হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি মানুষকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে দেয়, তেমনই তন্বীও যেন ঐশীর সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

ঐশী আজ জানে --
জীবন সহজ নয়, কিন্তু ভালোবাসা থাকলে, পাশে কেউ থাকলে...
সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করা যায়।

-- বন্ধু --

সুজাতা দাস

বন্ধু আমার -
কেমন আছিস ;
কেমন আছে মনটা তোর?
এখনও কি আগের মতই আছিস?
নাকি, অনেক বদলে গেছিস।
কতদিন - তোকে দেখিনি
চেনা সেই নামটা ধরে ডাকিনি;
তুই বলবি, ডাকিসনি কেন?
অভিমান করে আছিস কি এখনও!
আমি বলবো, অভিমানই বটে -
মনে কখন যে কি ঘটে -
**
চল না - সব অভিমান ভুলে যাই -
নতুন করে আবার বন্ধু হই --
তবে! - সে কি আর হয় ?
হলে তো সব দুঃখই মুছে যায়।
মনে পরে কি পুরানো সেই সব দিন !
কেমন করে মিটবে বন্দুকের ঋণ।

চারুবালা

রাজু দাস

আমি তখন ছোট্ট এক ছেলে; বয়স হবে সাত বা আট। হয়তো তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি সত্যিই এক ভূতের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছিলাম। আজ সেই ঘটনার কথা তোমাদের বলছি। তোমরাই বিচার করো, সত্যি না মিথ্যে।

সেই সময় ছিল শারদীয়া ছুটির। আমি মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। হাওড়া থেকে দূরে, বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের নামটা না হয় গোপনই থাক, শুধু বলি - হাওড়া স্টেশন থেকে একটা লোকাল ট্রেনে করে নামতে হত একটা ছোট্ট একটা রেলস্টেশনে। সেখান থেকে আবার চল্লিশ মিনিট বাসে চড়তে হত। ভাঙাচোরা রাস্তায় বাসের ঝাঁকুনিতে শরীরের সব হাড় যেন খুলে যেত, কিন্তু জানলার বাইরে চোখ রাখলেই মনটা অন্য জগতে চলে যেত। ধানখেতের বুক চিরে চলে গেছে পথ, পথের দু'ধারে ছোট ছোট মাটির বাড়ি, মাঝে মাঝে কাঁঠালের বাগান। সবুজের মাঝে সোনালী রোদের ঝিলিক, মাঠে কর্মরত লোকজন - এই পথ যেন নিজেই একটা গল্প বলে চলতো। আর কীভাবে যে সময় কেটে যেত, বুঝতেই পারতাম না - কখন যে মামার বাড়ি পৌঁছে যেতাম!" বাস থেকে নেমে আরও ১৫ মিনিট হাঁটতে হয় গ্রামের রাস্তা ধরে।

আমার মামার বাড়ি খুবই বড় এবং পুরোনো। একটু বাড়ির বিবরণ না দিলে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। বাড়িটা একটি পাঁচিলঘেরা বড় বাগানের মাঝখানে অবস্থিত। গেট থেকে বাঁধানো একটি পথ চলে গেছে বিশাল বড় সেই বাড়িটিতে। বাড়ির চারপাশে সারি সারি লম্বা সুপারি আর নারকেল গাছ। সেই গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আর বাড়ির পেছনে রয়েছে সান বাঁধানো ঘাটসহ একটি পুকুর। গেট আর পাঁচিলের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এ যেন শুধুই একটি বাগান। সেই বিশাল বাড়িটিকে বাইরে থেকে একদমই বোঝা যায় না।

* * * * *

সেবার মামার বাড়ি থাকাকালীন এক সন্ধেবেলা কোনো এক কারণে আমি মামার কাছে বকুনি খেয়ে রাগ করে ছাদে উঠে যাই। বাড়িটির ছাদটা বেশ বড়, আর চারদিক ঘেরা ছিল প্রায় ৩-৪ ফুট উঁচু (মানে অর্ধেক মানুষ সমান) এক পাঁচিল দিয়ে। ছাদের একদম মাঝ খান দিযে সিঁড়ি উঠেছে,যার মাথায় ছিল চিলেকোঠার ঘর। চিলেকোঠার ঘরের ভেতরে একটা ভাঙা টেবিল, দুটো আধভাঙা বেতএর চেয়ারের সঙ্গে আরও কিছু পুরনো ভাঙা আসবাবপত্র থাকত। আমি আর মামা কখনো কখনো বিকেলের দিকে ওই ঘরে বসে গল্প করতাম।

আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে আমি ওই চিলেকোঠার ঘরে বসে ছিলাম। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমে ঘরটা ছিল গুমোট, কিন্তু আমার মন ছিল তার থেকেও বেশি গুমোট - বকুনি খেয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমার ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি হতে শুরু করল। কোথা থেকে যেন এক মিষ্টি হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে এসে আমাকে এক আশ্চর্য আরামদায়ক অনুভূতি দিচ্ছিল। আর কিছুক্ষণ পর মনটা আপনি ঠান্ডা হয়ে এলো।

আমি চিলেকোঠার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি - নারকেল আর সুপারি গাছের পাতাগুলো একটুও নড়ছে না। তাহলে ঘরের ভেতরে আমার গায়ে, ঘাড়ে, এমনকি কানের পাশে এত মনোরম ঠান্ডা হাওয়া লাগছে কীভাবে? আজও সেই আশ্চর্য অনুভূতির কথা মনে আছে - যেন কেউ আমার রাগটুকু মুছে দিয়ে মনটা শান্ত করে দিলো।

সেদিন আর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে যখন নিচে নেমে যাই, তখন মনের গুমোট আর নেই।

* * * * *

সেদিন রাতে আমি, মা, মামা আর দিদা - সবাই মিলে একসাথে খেতে বসেছিলাম।

কিছুক্ষণ খাবার পর মামা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, তখন রাগ করে কোথায় গিয়ে বসেছিলি? আমি তোকে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না।'

আমি বললাম, 'আমি চিলেকোঠায় বসেছিলাম।'

মামা একটু থেমে, আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সন্ধে বেলায় একা ছাদে উঠে গেছিলি? তুই জানিস না, ছাদে একটা ভূত থাকে?'

মামার কথায় আমার রাগটা আবার চড়ে গেল। আমি বললাম, 'সেটা হতেই পারে না। আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না - ভূত বলে কিছু হয় না।'

আমার রাগ দেখে মামা প্রথমে ভ্রু কুঁচকালেন, তারপর হালকা হেসে বললেন, 'ভয় দেখাইনি। পরে মা বা দিদাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।'

আমি তখন মায়ের আর দিদার দিকে তাকালাম। ওরা চুপ করে সম্মতি জানাল। কিন্তু আমি আর কিছু বললাম না।

* * * * *

পরের দিন দুপুরবেলায়, ঘুমানোর সময়, আমি দিদাকে বললাম 'তুমি তো কাল শুনলে, মামা বলল ছাদে একটা ভূত থাকে। আর তুমি আর মা দুজনেই মাথা নেড়ে সায় দিলে। ভূত বলে কি কিছু হয়? হয় না তো!'

দিদা একটু হেসে বললেন, 'জানিস দাদা, আমি যখন প্রথম এই বাড়িতে শ্বশুরবাড়ি এলাম, তখন ছাদের ওই চিলেকোঠার ঘরটাই ছিল আমাদের ঠাকুরঘর। আর আমি এসেই পেলাম সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে সন্ধ্যে দেবার দায়িত্ব। আমি যখন সন্ধ্যেয় ছাদে সন্ধ্যে দিতে যেতাম, ছাদে ওঠার সিঁড়ির অর্ধেক উঠতেই মনে হতো, যেন কেউ আমার পেছন পেছন পা ফেলে উঠছে। আমি বারবার পিছন ফিরে দেখতাম - কেউ আছে কিনা। আর শুধু তাই নয়, যখন ঠাকুরঘরে বসে পুজো করতাম, মনে হতো কেউ যেন আমার পিছনে বসে আছে। একটা হালকা নিঃশ্বাসের শব্দ, যেন আমার ঘাড়ের কাছে পড়ে। এমন কিছুদিন চলার পর আমি ভয় পেয়ে গিয়ে আমার দিদিশাশুড়িকে সব বললাম।

দিদিশাশুড়ি বলেন - উনি হচ্ছেন চারুবালা। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, উনি কিছু করেন না।

দাদা, তারপর থেকে আমি আর একা সন্ধ্যে দিতে যাইনি। কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়েই যেতাম। তবে জানিস দাদা, উনি কোনোদিন কারো কোনো ক্ষতি করেননি।

আমি বললাম, "সত্যিই কি তাই হতে পারে দিদুন? আমার মনে হয় তোমার ভুল হতে পারে। আর ওই চারুবালাই বা কে? তুমি কী করে বলতে পারো, সে কারও ক্ষতি করবে না?"

দিদা বললেন, "ভয় পেয়েই তোর দাদু একবার তারাপীঠের এক সিদ্ধ সন্ন্যাসীকে ডেকে আনেন। উনি আমাদের বাড়িতে পূজাযজ্ঞ করিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন - ‘থাকুক না ও। ও তোদের কোনো ক্ষতি করবে না। বরং কোনো অমঙ্গল আসার আগে তোদের নানা উপায়ে সাবধান করে দেবে। তখন তোরা ওর উপস্থিতি বেশি করে টের পাবি। কিন্তু ভয় পাবি না—ও শুধু জানান দেবে, ক্ষতি করবে না।’

দিদা বললেন, 'আমার দিদিশাশুড়ি বলেছিলেন, চারুবালা আমাদের বংশের কেউ নন। এই বাড়ি তৈরির আগে যারা এখানে থাকতেন, তাদের মেয়ে ছিল চারুবালা। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তাদের পরিবার এখান থেকে চলে গেলে, আমরা এই জায়গা কিনে বাড়ি বানাই। কিন্তু চারুবালা হয়তো এই জায়গাটা ছাড়তে পারেনি...'

আমি বললাম, 'ধুৎ দিদুন! তুমি তো খুব ভীতু!'

দিদা একটু হেসে বললেন, 'আমি একা না দাদা, আমার আগেও অনেকেই চারুবালার উপস্থিতি অনুভব করেছেন। আমার শাশুড়িমা, এমনকি তোর দাদুও। ওর কথা আগে থেকেই বলতেন সবাই।'

* * * * *

সেই দিন বিকেলবেলায় আমি আর ছাদে গেলাম না। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। চারুবালাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সম্পর্কে আরও কিছু জানার। দিদা তো বলেছিলেন, সবাই কোনও না কোনওভাবে চারুবালাকে অনুভব করেছে। তবু মনে হচ্ছিল, কেউ যদি ভাবে আমি ভূতে ভয়

পাচ্ছি? তাই আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। তবে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল - আমি তো আগেও বহুবার মামার বাড়ি এসেছি! তখন তো কেউ চারুবালার কথা বলেনি! তবে কি তখন আমি ছোট ছিলাম বলেই?

সেই দিন রাতে, খাবার আগে একতলার ছাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। চারপাশে গাছের পাতায় চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছিল। আকাশটা পরিষ্কার ছিল, চাঁদটা বড় আর উজ্জ্বল। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল দোতলার চিলেকোঠার ঘরের দিকে। এখান থেকে ঘরের দরজার উপরের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। দরজাটা অল্প একটু ফাঁক ছিল—মনে হলো আজ সেটা ভালোভাবে বন্ধ করা হয়নি। আমি কিছু ভাবছিলাম না—শুধু তাকিয়ে ছিলাম। ঠিক তখনই একটা সাদা পেঁচা উড়ে এসে চিলেকোঠার ঘরের ছাদে বসলো। আধো-অন্ধকারেও মনে হলো ওটা যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। পেঁচা আগে বহুবার দেখেছি। এখানে ওরা খুবই সাধারণ। তবু না জানি কেন, সেই মুহূর্তে পেঁচাটাকে দেখে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল পিঠের নিচ দিয়ে। আমি আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেলাম..

* * * * *

রাতের খাবারের টেবিলে বসে বারবার মনে হচ্ছিল চারুবালার কথা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কেউ যদি ভাবে আমি ভীতু? তাই কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। শুধু বললাম, "ওপরে চিলেকোঠার ঘরটা খোলা আছে, কেউ বোধহয় বন্ধ করেনি।"

মামা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "ওই ঘরটা তো বন্ধ করা হয় না। সবসময় খোলা থাকে। কাল তো বললাম, চারুবালা থাকে ওই ঘরেই।" বলেই মাথা নিচু করে খেতে লাগল। আমার খুব রাগ হলো। আমি বুঝতেই পারছিলাম না - ও সত্যি বলছে, না আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। পাছে সবাই ভাবে আমি ভয় পাচ্ছি, তাই আমি আর কিছু বললাম না।

মা মামাকে বলল, "তুই কেন ওকে ভয় দেখাচ্ছিস ভাই?" আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "না না, আমি তো বিশ্বাসই করি না এসব। ভূত-টুত কিছু হয় না!"

মামা এবার মাকে বলল, "কেন দিদি, বিয়ের আগে যখন তুই এখানে ছিলি, রাত জেগে পড়তিস, তুই কি ছাদের শব্দ শুনিসনি?"

মা একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা ঠিক, কিন্তু, শুনেছি। আগে যখন রাত জেগে পড়াশোনা করতাম, অনেক রাতে চারপাশ যখন নিঃস্তব্ধ হয়ে যেত - তখন ছাদ থেকে জোরে হাঁটার আওয়াজ, বা ধপ ধপ করে চলাফেরার শব্দ পেতাম। একবার না, বহুবার। একদিনে তো দু-তিনবারও শুনেছি। খুব স্পষ্ট।"

আমি বললাম, "মা, তুমি কি মিথ্যে বলছ? আমায় ভয় দেখানোর জন্য?" মা হেসে বলল, "না রে, সত্যিই বলছি। তবে ভয় পাবার কিছু নেই "

মামাকে বললো, "আচ্ছা, ভাই। এখনো কি শুনতে পাস?"

মামা বলল, "কি জানি? ইদানিং এর মধ্যে খেয়াল করিনি। তবে হয় হয়তো । তবে সাধারণত মাঝরাতের দিকে হয়। তখন তো কেউ জেগে থাকে না।"

আমি বললাম, "তাহলে চল, আজ রাতে আমি জেগে থাকব। নিজে কানে শুনে দেখব! কেমন হয় শব্দ! নাকি সব মিছে কথা।"

মামা একটু হেসে বলল, "একদিনেই নাও শুনতে পেতে পারিস।" আমি বললাম, "একমাস আছি,"

দিদা এবার একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "কি দরকার বাবা! তিনি আছেন, থাক না।"

* * * * *

সেই দিন রাতে ডিনার শেষ করে আমি মায়ের সঙ্গে শুতে গেলাম। কিন্তু যথারীতি ঘুমালাম না - ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে অপেক্ষা করতে থাকলাম শব্দ শোনার জন্য। বারান্দার পুরনো দম-দেওয়া বড় কাঠের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। মা পাশ ফিরে শোবার সময় আমাকে জেগে থাকতে দেখে বলল, "কিরে, এখনো ঘুমাসনি কেন?" আমি বললাম, "কিছু না, ঘুম আসছে না।" তারপর থাকতে না পেরে প্রায় জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা মা, তুমি কি সত্যিই বলছ, তুমি চারুবালার পায়ের শব্দ শুনেছ?" মা একটু চুপ করে থেকে বলল, "দেখ, শুনেছি। ভুল হবার নয়। যখন রাত জেগে পড়তাম, প্রায়ই শুনতাম - অনেক রাতে, নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতায়

খুব স্পষ্ট শোনা যেত। এখানে তো রাতগুলো এমনিতেই খুব শান্ত। মাঝে মাঝে মনে হতো, যেন নূপুর পায়ে কেউ হেঁটে চলেছে।” আমি মায়ের পাশে ঘেঁষে শুলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, “ভয় পেতে না মা?”

মা বলল, “না, ছোটবেলা থেকেই এসব গল্প শুনে বড় হয়েছি তো। আর শব্দগুলো এতবার শুনেছি যে, কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, মাঝরাতে ছাদে গিয়ে কখনো দেখিনি। তবে ভাই, মানে তোর ছোট মামা, তোর মতোই ছিল—বিশ্বাস করত না। তাই ও অনেকবার ছাদে গিয়ে দেখেছে। কিছু পায়নি। শুধু একটা সাদা পেঁচা থাকে—এটাই বলতো।”

আমি বললাম, “তবে মামা যে বলল ছাদে যাবি না, চারুবালা আছে... মামাও তো বিশ্বাস করত না তাহলে?”

মা বলল, “সে তো জানি না। তুই ওকে নিজেই জিজ্ঞেস করিস। এখন ঘুমা।” এই বলে মা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাইরে একটা পেঁচা ডেকে উঠলো। সেই সাদা পেঁচাটা কি? গা একটু সিউড়ে উঠলো। কিন্তু আমি ঘুমাতে পারলাম না। অপেক্ষা করতে থাকলাম... ওই শব্দটার জন্য। ভোররাতে একটা শব্দ পেয়ে আমি উঠে বসলাম। পাশে মা ঘুমোচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে, কোনো শব্দ না করে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। হঠাৎ আবার সেই আওয়াজটা কানে এলো - এইবার অনেকটা কাছ থেকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি চিলেকোঠার ঘরটা খোলা। ভেতর থেকে ছোট মামার গলা! আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি এগোতেই দেখি... ঘরে কেউ নেই। শুধু একটা বড় সাদা পেঁচা, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে বেরিয়ে পড়লো - “চারুবালা...”

আবার শুনলাম - একেবারে স্পষ্ট - আমার নাম! ধড়মড় করে উঠে দেখি - মামা আমায় ডাকছে। জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কাল রাতে। স্বপ্ন দেখছিলাম।

মামা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, “তুই কি চারুবালার স্বপ্ন দেখছিলি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ‘চারুবালা’ বললি, মনে হলো।” আমি বললাম, “না তো।”

* * * * *

মামা আর কিছু না বলে কাজে চলে গেল। দুপুরবেলায় আমি আর মামা একসাথে খেয়ে মামার ঘরে শুতে গেলাম। মামার আর আমার ঝগড়া তা এখন প্রায় মিটেই গেছে। দুপুরে আমার বা মামার কারোরই ঘুম হয় না - বই পড়ি বা গল্প করি। তাই, চিলেকোঠার চারুবালার ঘরে বসেই আড্ডা দিতাম। আজ ঘরেই শুয়ে ছিলাম। কেন জানি না, নিজে থেকে মামাকে চারুবালার কথা জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, মামা যদি আমায় খুব ভীতু ভাবে!

হঠাৎ মামাই জিজ্ঞেস করল, "কিরে, সকালে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চারুবালা বলছিলি কেন আজ?"

আমি বললাম, "আবার না গো! আমি তো কিছু বলিনি!"

মামা বলল, "না, আমি স্পষ্ট শুনেছি!"

আমি বললাম, "মা বলছিল, তুমি তো চারুবালায় বিশ্বাস করো না! তুমিই তো ছাদে গিয়ে দেখে আসতে, কেউ আছে কিনা। তাহলে আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

মামা হেসে বলল, "আচ্ছা, এই বাড়িটা কে তৈরি করেছে তার নাম জানিস? মানে, তোর দাদুর দাদু—তার নাম?"

আমি মাথা নাড়লাম। মামা বলল "তোর মাকে, দিদাকে জিজ্ঞেস করিস, বলতে পারবে না একচান্সে, অনেক ভেবেও মনে করতে পারবে না হয় তো। অথচ তারও অনেক আগে মারা যাওয়া চারুবালার নাম সবাই মনে রেখেছে। সে তো আমাদের ফ্যামিলির কেউ হয়ও না! কেন?"

আমি বললাম, "ভয় পায় বলে।"

মামা বলল, "কিছু নেই তো ভয় কিসে পায়। তোর দাদু, তার বাবা, তার বাবা, - সবাই মারা গেছে এই বাড়িতেই। কই তাদের তো কেউ ভয় পায় না? চারুবালাকে নিয়েই এই ভয়? আর সেতো আজ পর্যন্ত কিছু করেনি কাউকে!"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। সব কেমন যেন গোলমেলে লাগলো। বললাম, "তুমি কি বলতে চাও চারুবালার ভূত আছে? তুমি দেখেছো? সাদা পেঁচা হয়ে?"

মামা একটু চুপ করে থেকে বলল, "চারুবালা তো সেই কবে মরে গেছে, সে অতীত। কিন্তু আজও যদি সকলে ভূত বলে শুধু চারুবালাকেই অনুভব করে—তবে আমি কি বলতে পারি বল?"

আমি আর কিছু বললাম না। মামাও কি একটা বই পড়তে লাগলো।

* * * * *

রাত্রে ডিনার শেষ করে মামার সাথে শুতে গেলাম। মামা ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু আমি অপেক্ষা করে রইলাম। কেন জানি না, চারুবালা যেন আমার মাথা থেকে কিছুতেই বেরোচ্ছে না। সেই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ যেন একটা শব্দ কানে এলো—ঠিক যেন ভারী কিছু ছাদে পড়ে যাওয়ার শব্দ।

আমি মামার দিকে তাকালাম। মামা তখন ঘুমিয়ে। যদি জেগে থাকত, তাহলে হয়তো বলা যেত, এটাই কি সেই চারুবালার শব্দ?

বাইরের বড় ঘড়িতে “ঢং” করে একটা বাজল। নিশুতি রাত। নিঃশব্দ চারিদিক।

ওই শব্দ শোনার পর থেকে আমার সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবার একটা শব্দ হলো। খুব স্পষ্ট- এটা ভুল শোনার সুযোগই নেই।

তারপর মনে হল, কেউ যেন ধীরে ধীরে পা ফেলে হেঁটে চিলেকোঠার ঘরের দিকে যাচ্ছে।

ওই অনুভূতি বলে বোঝানো যায় না। গা-টা শিরশির করে উঠল। আমি মামার গা ঘেঁষে শুয়ে রইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সেই অদ্ভুত পায়ের শব্দ শুনতেই থাকলাম। বাইরের ঘড়িতে “ঢং ঢং ঢং” করে তিনটে বাজল।

এমন সময় হঠাৎ দূরে কোথাও একটা পেঁচা "হুঁউ হুঁউ" করে ডেকে উঠল। কি করুন শোনালো ডাক টা তা বোঝানো যাবে না। ইটা কি ওই সাদা পেঁচা টা?

হঠাৎ মনে পড়ল দিদার কথা - দিদা বলেছিলেন, “যখন বাড়ির ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন চারুবালা খুব জোরে আওয়াজ করে সেটা জানান দেয়।” আজ তো আমি অনেকবার চারুবালার আওয়াজ শুনলাম!

তবে কি সত্যিই কোনো বিপদ আসন্ন?

* * * * *

পরের দিন যখন আমার ঘুম ভাঙলো, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। ছাদ থেকে ভেসে আসা মামার গলার শব্দ শুনে, ব্রাশ আর মাজন হাতে সোজা ছাদে উঠে গেলাম।

গিয়ে দেখি, ছাদে কেউ নেই। হয়তো ভুল শুনেছিলাম। চিলেকোঠার ঘরের দরজাটা হালকা ভেজানো। দরজা খুলে ঢুকব কি না একটু ভেবে, ধীরে ধীরে ঠেলে ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালাম। ঘরটা যেন একেবারেই স্বাভাবিক—যেমন ছিল, তেমনই। ছাদেও কিছু বদলায়নি। ছাদের পিছনের দিকে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, নিচে মামা পুকুরঘাটের সান বাঁধানো ঘাটে দুজন কাজের লোকের সঙ্গে কিছু একটা বলছে। মামা বাইরে যাওয়ার নতুন জামা পরে পুরো রেডি।

ওকে দেখেই কেন জানি না, হঠাৎ কাল রাতের ঘটনাটা ঝাঁপিয়ে এলো মনে। চারুবালার পায়ের আওয়াজ শুনেছিলাম বারবার। মনে হলো... কিছু একটা হতে চলেছে। একটা অদ্ভুত অস্থিরতা চেপে বসলো বুকের মধ্যে। কাল রাতেও তো তাহলে কি সেই "আসন্ন বিপদ" আজ?

আমি আর দেরি না করে জোরে জোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচে। সোজা গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, মামা কোথায় যাচ্ছে?"

মা বললো, "মনে হয় মামা দু'দিনের জন্য কলকাতা যাবে, কিছু জিনিস কিনে আনতে। পরশুদিন ফিরে আসবে।"

হঠাৎ মনের মধ্যে আরও প্রবল জোরে যেন কেউ বাধা দিতে চাইলো। আমি বললাম, "আমি এই ক'দিনের জন্য এলাম, আর মামা চলে যাবে কাজে?" মা বললো, "এক দিনের জন্য তো। কাজ কি আটকে থাকে?"

আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, পিছনের দরজা দিয়ে মামা বাড়িতে ঢুকছে। আমি: মামা, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

মামা: আরে! উঠলি? কোলকাতা যাচ্ছি দু'দিনের জন্য, কিছু জিনিস কেনার আছে। তোর জন্য কিছু আনবো নাকি?

আমি: (অস্থিরভাবে) কিন্তু এখন যেও না মামা। প্লিজ!

মামা: কেন রে? কি হয়েছে?

কি হয়েছে আমি মামাকে কি করে বলি! মা আমাকে বকা দিয়ে উঠল, 'মামার কি কাজ নেই?'

আমি বললাম, 'মামা, তুমি যেও না।' বলতে বলতেই আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে ঘরে চলে গেলাম। যাই হোক, আমার সেই কান্নার জন্যই সেদিন মামার যাওয়া হয়নি।

* * * * *

রাতে খাবার টেবিলে মামার কাছে শুনলাম, আমাদের গ্রাম হয়ে যে বাসটা রেলস্টেশনে যায়, সেটার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা গেছে, আর জনা দশেক যাত্রী খুব গুরুতর আহত।

দিদা বলল, 'ভাগ্যিস খোকার মনে কু ডেকেছিল, তাই আজ তুই যাসনি!'

আমি আর কাউকে কিছু বললাম না। সত্যিই আমার মনে কু ডেকেছিল? নাকি চারুবালা কোনোভাবে জানিয়ে দিয়েছিল? না কি... সবটাই শুধুই একটা কাকতালীয় ঘটনা?"

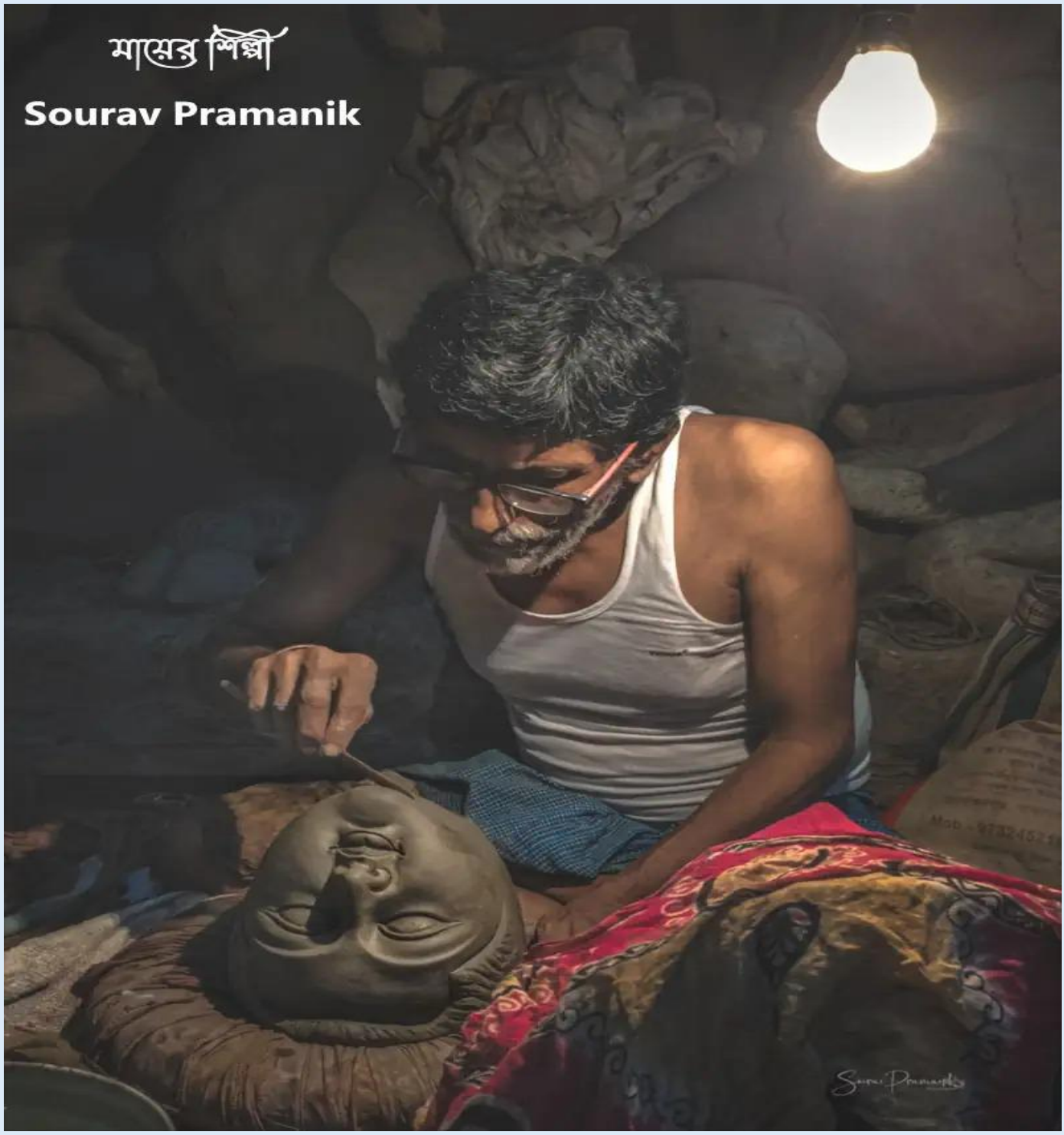
মায়ের আগমন

পূজা ঘোষাল

শিউলির গন্ধ মেখে আসে উৎসবের প্রভাত,
ঢাকের তালে শহর জাগে, আলো ঝলমল রাত।
চাল-ডালের দামে আগুন, বাজারে পথে হাহাকার,
তবুও মায়ের আগমনে ভরে ওঠে সংসার।
ইএমআই–এর ফাঁসের টানে কেটে যায় যে দিন,
ক্লান্ত মানুষ তবুও মাতে, কেনাকাটায় হয় রঙিন।
এমনই করে সপ্তমী আসে,
ভোরের আলোয় মণ্ডপ হাসে,
নতুন আলোয় ভরে ওঠে প্রতিটি মন,
সব দুঃখ ভুলে তাই উৎসবে হয় মগন।

ফটো প্রতিযোগিতা : দুর্গা পূজা ২০২৫

দুর্গাপূজার উৎসবমুখর মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরায় ধরে রাখার জন্য আয়োজিত হয়েছিল Sayzz Journal ফটো কনটেস্ট – সেপ্টেম্বর ২০২৫। সকল অংশগ্রহণকারীর সুন্দর ছবিগুলো আমাদের মন জয় করেছে। নির্বাচিত ভোট ও বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এবারকার প্রতিযোগিতার সেরা বিজয়ী হলেন :-



একুরিয়ামে রঙিন মৎস্য পালন: শিশু মনের বিকাশে সৃজনশীলতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা

গৌতম দাস

বর্তমান সমাজে শিশুদের শৈশব ধীরে ধীরে মোবাইল, ট্যাব ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠছে। ফলস্বরূপ শিশুদের প্রাকৃতিক কৌতূহল, সৃজনশীল চিন্তাশক্তি ও মানসিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে একুরিয়ামে রঙিন মৎস্য পালন একটি বিকল্প শিক্ষণ-অভিজ্ঞতা হিসেবে শিশুদের মানসিক বিকাশে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। এ গবেষণামূলক আলোচনায় শিশুদের মানসিকতা গঠনে রঙিন মৎস্যপালনের ইতিবাচক প্রভাব এবং অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক্স ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হবে।

একুরিয়ামের পরিবেশ ও শিশুমনের বিকাশ

রঙের প্রভাব: মনোবিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী উজ্জ্বল রং শিশুদের মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং আবেগগত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জাগায়। রঙিন মাছের গতি ও আভা শিশুমনের প্রশান্তি ও আনন্দবোধ জাগাতে সহায়ক।

ধৈর্য ও যত্নশীলতা: মাছকে নিয়মিত খাবার দেওয়া, পানির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা—এসব কর্মকাণ্ড শিশুকে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য শেখায়।
কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা: মাছের চলাফেরা, প্রজনন, বা আচরণ লক্ষ্য করা শিশুদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা উন্নত করে।
সৃজনশীলতার বিকাশ: একুরিয়ামের নকশা সাজানো, রঙিন পাথর, গাছপালা বসানো ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু নিজের কল্পনা ও নান্দনিক রুচি প্রকাশ করতে পারে।

ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ও মোবাইলের ক্ষতিকর দিক :-

মনোযোগ বিচ্ছুরণ: অতিরিক্ত মোবাইল গেম ও ভিডিও দেখার ফলে শিশুদের মনোযোগ ক্ষমতা কমে যায়।
সৃজনশীলতার ক্ষয়: ভার্চুয়াল কন্টেন্ট শিশুদের প্রস্তুত ছবি ও গল্প দেয়, যেখানে কল্পনার জায়গা সীমিত থাকে। ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবণতা হ্রাস পায়।
মানসিক চাপ ও উদ্বেগ: অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: বাস্তব খেলা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কমে গিয়ে শিশুর একাকীত্ব ও সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি তৈরি হয়।



তুলনামূলক বিশ্লেষণ :-

যেখানে গ্যাজেট শিশুদেরকে নিষ্ক্রিয় ভোক্তা করে তোলে, সেখানে একুরিয়ামে মাছ পালন শিশুদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তোলে। গ্যাজেট শিশুদের অস্থায়ী আনন্দ দেয়, অথচ একুরিয়ামের পরিবেশ শিশুদের স্থায়ী মানসিক প্রশান্তি ও সৃজনশীল বিকাশ নিশ্চিত করে। রঙিন মাছ শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, যেখানে গ্যাজেট তাদের ভার্চুয়াল জগতে আবদ্ধ রাখে।

শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য একুরিয়ামে রঙিন মৎস্য পালন একটি কার্যকর বিকল্প শিক্ষণমাধ্যম। এটি শিশুকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, ধৈর্য শেখায় এবং মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত মোবাইল ও গ্যাজেট নির্ভরতা শিশুদের কল্পনাশক্তি ক্ষয় করে এবং মানসিক চাপ বাড়ায়। তাই অভিভাবকদের উচিত শিশুদের জন্য একুরিয়াম বা অনুরূপ প্রকৃতিনির্ভর কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া এবং গ্যাজেট ব্যবহারের সময়সীমা সীমিত করা।

মহাশূন্য

তিয়াসা দত্ত

হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া আলো,
একটু দূরে শান্ত মতো নীল, আবছায়া
একগোছা ফুল তুলে আনে বাতাস, নৈবেদ্য...
দূরে ভেসে যায় কোন্ নাবিক সমুদ্র,
এলোমেলো বিকেল বাজে ক্রমশ, যেন বাউল মন!

দেবতার পায়ে পড়ে থাকে গোধূলি আলো,
ছোঁয়াচে আঁধার পেরিয়ে সন্ধেফুল ফোটে, জারজসন্তান...
খসে পড়া তারার মতো দ্রুত এসে দাঁড়ায় নেমেসিস;
এ হল্টস্টেশনে নিস্তব্ধতার কোনো সংজ্ঞা থাকে না
ইষ্টনামে লেগে থাকে যুবতীর গন্ধ, আদুড় গায়ের স্বাদ।

নিঃস্ব পাইনের বুকে নিয়ে গেছে শব্দ দল,
পাহাড় রেখে ফিরে গেছে আলো, তোমার পিতৃত্ব!
ছোঁয়াচে চোখে লেগে থাকে লাল সাকুরা,
আদিগন্ত ভেবে তুলে আনি 'মহাশূন্য'...

আদতে সকাল ও ঈশ্বরে কোনো পার্থক্য ছিল না।

অঙ্কন বিভাগ

সৃজনশীলতা ও নিখুঁত আঁচড়ে বিচারকদের মুগ্ধ করেছেন দেবলীনা ব্যানার্জি (দ্বাদশ শ্রেণী)। রঙের ছোঁয়ায় কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই প্রতিযোগী। তাঁর এই অসাধারণ কাজকেই দেওয়া হয়েছে প্রথম স্থান।



Sayzz Journal - এর এই সংখ্যাটি পড়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
আপনার মতামত ও পরামর্শ আমাদের পরবর্তী সংখ্যাকে আরও সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবে।

👉 আপনার মূল্যবান ফিডব্যাক জানান এখানে: sayzz.com/support/contactus.php

📧 ইমেইল করুন: **inbox.sayzz@gmail.com**

📧 ইমেইল করুন: **goutamdas007@gmail.com**

আমাদের আগামী সংখ্যার জন্য আমরা খুঁজছি **ফটোগ্রাফি, আঁকা, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ** সহ সব ধরনের সৃজনশীল কাজ। আপনার সৃষ্টি পাঠিয়ে দিন, পরের সংখ্যায় প্রকাশের সুযোগ পেতে আজই আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।

আপনার প্রতিভা হোক আমাদের পরবর্তী জার্নালের অনুপ্রেরণা!